গণতন্ত্রের রথ

জহর সরকার

হরেকৃষ্ণ মহতাব ১৯৪৮ সালে বলেছিলেন, বৌদ্ধধর্ম থেকেই জগন্নাথ-ভজনার উৎপত্তি। বিস্তর চেঁচামেচি হয়েছিল তা নিয়ে। একই কথা তার আগে ও বলেছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, এবং হান্টার, কানিংহ্যাম বা মনিয়ের-উইলিয়ামস-এর মতো ব্রিটিশ পণ্ডিতরাও। কিন্তু বিপরীত মতের ইতিহাসবিদরা সমান জোরের সঙ্গে বলেছেন, 'বৌদ্ধধর্ম থেকে এই ধারাটির জন্ম হতে পারে না, পরবর্তী কালে এর উপর বৌদ্ধধর্মের প্রবল প্রভাব পড়েছে।' ইতিহাসবিদ কেদারনাথ মহাপাত্রের মতে, পুরীর তিন দেবতার উৎস আসলে জৈন ত্রি-রত্ন। আবার গীতার ত্রিগুণা অধ্যায় থেকেও এসেছে জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার কল্পনা।

জগন্নাথ-উৎসব দেশের অন্যতম প্রাণময় জনপ্রিয় উৎসব। কিন্তু শুধু তা-ই নয়। এর নানা বিশেষত্ব আছে। এটাই বোধহয় একমাত্র দৃষ্টান্ত যেখানে কোনও জনজাতীয় দেবতাকে ধাপে ধাপে গুরুত্বের সিঁড়িতে না চড়িয়ে একেবারে সরাসরি, অত্যন্ত সচেতন ভাবে, হিন্দু দেবস্তম্ভের মাথায় বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। মানব-আকৃতি-বিহীন এই রকম কাঠের লম্বা টুকরো বসিয়ে পুজো করার চলটি নাকি এসেছিল সবর বা সৌর জাতির থেকে। কেউ কেউ বলেন, না, কোন্ড জাতির মানুষ এই পুজোর প্রবর্তক। যাই হোক, আজও কিন্তু জগন্নাথের পুজোর জন্য বিশেষ ভাবে অব্রাহ্মণ পুরোহিত রাখা হয়, 'দৈতা' আর 'সুয়ারা', যাঁরা নাকি সবর-দের বংশধর। খেয়াল করার বিষয়, জগন্নাথের ক্ষেত্রে কিন্তু অন্য দেবতাদের মতো প্রাচীনত্বের গৌরব করা হয় না। নবকলেবর উৎসবের মধ্য দিয়ে যে নিমকাষ্ঠদণ্ডগুলি প্রতি দশ-কুড়ি বছর অন্তর পাল্টানো হয়, সেটা খোলাখুলি সবাই জানতে পারেন। আক্ষরিক ভাবে এই অনুষ্ঠানের মানে হল, পুরনো শরীর ত্যাগ করে নতুন কলেবর ধারণ করা । এ বছরও এই উৎসবটি হয়েছে। এর জন্য 'পবিত্র গাছ'টির খোঁজ শুরু হয় অনেক আগে থেকে। পুরোহিতরা সে কাজ করেন, সঙ্গে থাকেন দু'জন ইনস্পেক্টরের অধীন ত্রিশ জন পুলিশ অফিসার। গাছ খুঁজে পেলে তার সামনে একটা যজ্ঞ হয়, তার পর সে গাছ কাটা হয়, এবং মন্দিরে নিয়ে আসা হয়। বংশপরম্পরায় এ কাজে দক্ষ ভাস্কররা গোপনে কাজ করেন টানা পক্ষকাল, দিবারাত্রিব্যাপী। পুরনো মূর্তিগুলিকে একই রকম গোপনীয়তায় সমাধিস্থ করা হয়। হিন্দুরা দেবতাকে মানবাকারে এবং অন্য-আকারে, দুই ভাবেই পুজো করেন (যেমন শিবলিঙ্গ): জগন্নাথদেবের স্থান কিন্তু এর মাঝামাঝি। জনজাতীয় কাষ্ঠদণ্ডে পরবর্তী কালে হিন্দু ঐতিহ্য অনুসারে দুটি ছড়ানো হাত যোগ করা হয়, সঙ্গে যুক্ত হয় বিশাল চোখ দুটি। আর, অবশ্যই, রঙ লাগাতে হয় দেবমূর্তির উপর।

জগন্নাথদেবের বিপুল জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ কিন্তু তাঁর এই গণতান্ত্রিক আবেদন। যে দেশে মন্দিরের দেবমূর্তি গর্ভগৃহের নিভৃতির বাইরে বার করার চলটাই নেই, সেখানে তাঁকে ঘিরে এমন একটা আচার এত কাল ধরে চলে আসছে, বিরাট ব্যাপার বলতে হবে। অন্যান্য মন্দিরের ক্ষেত্রে কেবল দেবতার উৎসবমূর্তিটুকু সামনে রেখেই মানুষের মিছিল হয়। আর জগন্নাথ, বলভদ্র, সুভদ্রা? আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে এঁদের তিন জনকে এক-একটি দারুণ কারুকার্যখচিত রথে চড়িয়ে মিছিলের মধ্যে সরাসরি বার করা হয়। দুই কিলোমিটার দূরে গুন্ডিচা মন্দিরে 'মাসির বাড়ি' যায় সেই রথ, জগন্নাথ তাঁর প্রিয় পোড়া-পিঠা খেয়ে ফেরত আসেন এক সপ্তাহ পর। খোলা রাস্তায় জগন্নাথকে নিয়ে এই যাত্রায় জাত-শ্রেণি-নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষের অংশগ্রহণ চলে আসছে মধ্যযুগ থেকে: আমাদের অসাম্য-অধ্যুষিত হিন্দু ধর্মসংস্কৃতিতে ব্যাপারটা বেশ আশ্চর্য রকম নয়? প্রাচীন রাজ্য দশপল্ল থেকে গাছ কেটে এনে প্রতি বছর তিনটি রথ নতুন করে তৈরি হয়। সে গাছই বা কী ভাবে আসে? কাটার পর কাঠ ভাসিয়ে দেওয়া হয় মহানদীর জলে, ভাসতে ভাসতে

সেগুলি পৌঁছয় পুরীতে। অর্থাৎ প্রতিটি পর্বেই দরকার বিশদ পরিকল্পনা। ভারতীয়দের চরিত্রের সঙ্গে সেটাও সাধারণ ভাবে বেমানান বইকী!

চালু বিশ্বাস, আদি শংকরাচার্য হিন্দুধর্মের চারটি ধাম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পুরী তাদের একটি। বৈষ্ণব সাধক আচার্য রামানুজ দ্বাদশ শতকে সেখানে একটি মঠ তৈরি করেন। পুরীর মন্দিরের যে ইতিহাস তার মাদালা-পাঞ্জিতে লিপিবদ্ধ, তার থেকে জানা যায় পূর্ব গাঙ্গেয় দেশে রাজা অনঙ্গ ভীম ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে এখনকার মন্দিরটি স্থাপন করেন। অবশ্য দাসগোপাস শিলালিপি বলছে, আরও দুই শতাব্দী আগে চোড়া-গঙ্গা এর প্রতিষ্ঠাতা। এ দিকে জার্মান গবেষকরা আবার জানাচ্ছেন যে প্রথম যযাতি এই মন্দির শুরু করেন আরও এক শতক আগে। সব মিলিয়ে ব্যাপারটা এখনও ধোঁয়াটে। প্রাচীন শিলালিপিতে দেবতাকে পুরুষোত্তম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হিন্দু ভাবধারার মধ্যে এ ভাবে মিশে যেতে, আর নিজের অন্য দুই সঙ্গীকে মন্দিরে আনিয়ে অধিষ্ঠিত করতে আরও অন্তত গোটা দুয়েক শতাব্দী লেগেছে, ধরেই নেওয়া যায়।

‘পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র মাহাত্ম্য’-এ নানা মজার গল্প আছে। এই যেমন, বিদ্যাপতি কী ভাবে প্রকৃত দেবতা নীলমাধবকে এক বার চোখের দেখা দেখতে পাওয়ার জন্য সবর-নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। ইতিহাস খুঁজেপেতেও এই ঘটনার প্রামাণ্য তারিখ পাওয়া যায় না। তবে সন্দেহ নেই, জগন্নাথের এই আখ্যান ত্রয়োদশ শতক থেকেই সব শ্রেণির ওড়িশাবাসীকে এক আরাধনার আধারে মেলাতে পেরেছিল। ভারতের অন্য কোনও অঞ্চলে এমন আর কোনও ঘটনা ঘটেছে বলে জানা নেই, যেখানে সমাজে জাতিভেদ আর শ্রেণিভেদ প্রবল মাত্রায় থাকলেও ধর্মীয় আচারে তার প্রভাব পড়েনি। এবং সম্ভবত এর থেকেই বোঝা যায়, কেন একের পর এক তুর্কি ও পাঠান আক্রমণের সামনে ওড়িশা কিছুতেই মাথা নোয়ায়নি। যেখানে বাংলায় সেন বংশের রাজারা সহজেই পরাজিত হয়েছিলেন, ওডিশা চার-চারটি শতাব্দী ধরে এই প্রবল চাপ প্রতিহত করেছিল।

বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্যর মতো আরও অনেকেই জগন্নাথের থেকে আধ্যাত্মিক প্রেরণা খুঁজে পেয়েছিলেন। পুরীর পুরোহিতরা বহু বার এখানে এসেছেন, পুরীধামের মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন। প্রজন্মের পর প্রজন্ম বাঙালি পুরীধামে পুজো দেওয়ার চলটি ধরে রেখেছে। দক্ষিণবঙ্গে রথযাত্রা অনুকরণ করে ধুমধাম করে পালন করা হয়। মাহেশের রথ তো নাকি ছয় শতকের পুরনো। গুপ্তিপাড়া আর জঙ্গিপাড়ার রথ-উৎসবও খুবই বর্ণময়, প্রচুর লোক-সমাগম সেখানে। মহিষাদলের রথ টানার সময় বন্দুকের গুলি ছোড়ার রেওয়াজ। পশ্চিমবঙ্গের বহু জায়গায় রথতলা দেখা যায়, বড় বড় কাঠের তৈরি রথ সারা বছর সেখানে রাখা থাকে। রথযাত্রা আর রথের মেলার পেঁয়াজি পাঁপড় মিলিয়ে সে একটা হইহই উৎসব এই বাংলায় প্রতি বছর, অঝোর বর্ষার মধ্যেই। স্বাভাবিক। ধর্মানুষ্ঠান যে ব্যবসার পক্ষে বিশেষ অনুকূল, কে না জানে!

আসলে, পাথর কিংবা কাঠ, এ সব দিয়ে তো শেষ পর্যন্ত আরাধ্য দেবতার এই বিপুল জনপ্রিয়তা ব্যাখ্যা করা যায় না। বরং নানা রকম বিশিষ্টতা আর সর্বজনীনতা, এই দুইয়ের উপর ভর করেই একের পর এক সহস্রাব্দ পেরিয়ে এসেছে এই ধর্মোৎসব। রমরম করে পালিত হয়ে চলেছে।

প্রসার ভারতী-র সিইও, মতামত ব্যক্তিগত